ড. ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

অনুবাদ

অধ্যাপক ড. রহমান হাবিব

সম্পাদনা

প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

মূল
ড. ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী

অনুবাদ
অধ্যাপক ড. রহমান হাবিব

গ্রন্থস্বত্ব
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
দোকান নং ৩০২ (তৃতীয় তলা), ৩৮/৩ বাংলাবাজার
(বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট), ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২২

মূল্য
৪২০.০০ টাকা

Islam O Onnano Dhormo *'Islam and Other Faiths'*
Written by Dr. Ismail Raji al-Faruqi

Contacts
Shop No # 302 (2nd Floor), 38/3 Banglabazar
(Books & Computer Complex Market), Dhaka-1100
Phone: (+88) 01400 403 949, 01400 403 958, 02-58954256
E-mail: biitpublications@gmail.com

ISBN
978-984-95729-4-7

উৎসর্গ

পৃথিবীর প্রকৃত সত্যসন্ধানী
সকল নর-নারীর উদ্দেশ্যে

অনুবাদকের ভূমিকা

ড. ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী প্রণীত Islam and Other Faiths গ্রন্থটি আমি *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম* শিরোনামে অনুবাদ করেছি। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থ হিসেবে এটি সুখপাঠ্য। ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, নৈতিকতা, অর্থনীতি, শিক্ষা, মনোবিজ্ঞানসহ জ্ঞানের শাখা-প্রশাখার পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞানের কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ততা আছে এ গ্রন্থে।

ড. ফারুকী ফিলিস্তিনি দার্শনিক, উদার মানবতাবাদী ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব। ম্যাকগিল ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়সহ আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তেইশটির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং ইসলামসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের জন্য তিনি শুধু ভাবেননি; বরং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জীবনপণ করে সাধনা করে গেছেন। বর্তমান বিশ্বে এ দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বশান্তি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান জ্ঞানতত্ত্ব। তাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্বধর্মতত্ত্ব'সহ প্রাগ্রসর ধর্মচিন্তকদের প্রয়োজন তথা বাংলাদেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক শৃঙ্খলার অন্তর্গত প্রাজ্ঞতাকে বর্ধিত করার লক্ষ্যে আমি আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদের প্রয়াস গ্রহণ করেছি।

মধ্যপ্রাচ্য, আরব, ইরান, ইরাকসহ ইউরোপ-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতায় এই গ্রন্থটি বিশ্লেষিত হয়েছে। নতুন বিশ্বজ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা তিনি এই গ্রন্থে ইসলামকে বিশ্ব ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অন্যান্য ধর্মের সাথে প্রতিতুলনায় জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিপাদিত করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের জন্য গ্রন্থটি আমি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।

গ্রন্থটির জ্ঞানতাত্ত্বিক গভীরতা সকল ধর্মের মানুষকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে এই প্রার্থনা আমার।

ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিনয়াবনত,

ড. রহমান হাবিব
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রকাশকের কথা

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দোদুল্যমানতা থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধান। বিশ্বায়নের বর্তমান রূপ এবং ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিশালী উপস্থিতি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ইসলামের সভ্যতাগত সংলাপের ক্ষেত্রকে দিনকে দিন অপরিহার্য করে তুলেছে। এ ব্যাপারে ড. ইসমাইল রাজি আল-ফারুকীর তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ Islam and Other Faiths জ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা। বইটি *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম* নামে অনুবাদ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া-ঝিনাইদাহ)-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রহমান হাবিব। কষ্টসাধ্য এ কর্মকে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ড. রহমান হাবিব ধন্যবাদ।

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে বিআইআইটি পাবলিকেশন্স অত্যন্ত আনন্দিত। গ্রন্থটির জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্বধর্মতত্ত্ব' বিভাগসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রাগ্রসর ধর্মচিন্তা তথা বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক শৃঙ্খলার অন্তর্গত প্রাজ্ঞতাকে বর্ধিত করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অধিকন্তু গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী সকল ধর্মের মানুষকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে ইনশাল্লাহ।

ড. এম আবদুল আজিজ
ম্যানেজিং পার্টনার
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রস্তাবনা

আমার জীবনে একটি সময় ছিল... পাশ্চাত্য থেকে আমি আমার শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বিজয়ী হবো– এটি আমাকে প্রণোদিত করতো। কিন্তু যখন আমি তা জয় করলাম; আমার কাছে তা অর্থহীন হয়ে পড়লো। আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম- আমি কে? একজন ফিলিস্তিনবাসী, দার্শনিক, উদার মানবতাবাদী? আমার উত্তর ছিল- আমি একজন মুসলমান।

[এম. তারিক কোরাইশি, *ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী: এক স্থায়ী উত্তরাধিকার* (প্লেইনফিল্ড, ইন্ডিয়ানা: The Muslim Students Association, ১৯৮৭) পৃ. ৯]

১৯৮৬ সালের ২৭ শে মে মুসলিম বিশ্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায় ইসমাইল রাজি আল-ফারুকীর মতো একজন প্রাজ্ঞ, উদ্যমী এবং কর্মনিষ্ঠ সহকর্মীকে হারাল। Islam and Other Faiths গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে বিশ শতকের এ মহান মুসলিম চিন্তাবিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কতিপয় প্রখ্যাত মুসলিম বুদ্ধিজীবী তাঁদের ইসলামিচিন্তার ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মিলন ঘটিয়ে ইসলামি দর্শনের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন অ-মুসলিম পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনতা ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়টিকে আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। নির্বাচিত কয়েকজনের মধ্যে ইসমাইল আল-ফারুকী বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

ফারুকীর কাছে ইসলাম একটি সার্বজনীন আদর্শের নাম। যে আদর্শকে তিনি সমাজ ও সংস্কৃতির দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকার মর্মকেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিশ্বজনীন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিকে লেখালেখি, বক্তৃতা ও আত্মসংলাপের মাধ্যমে আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিকভাবে উপস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন।

ইসলামি বিশ্বাস ও অঙ্গীকারের আয়না দিয়ে আল-ফারুকী বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিন্তনের কেন্দ্রে ইতিহাস, আত্মসত্তার পরিচয়, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সামাজিক নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্টতা ছিল। তিনি মুসলিম বিশ্বের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও ইসলামি দর্শনের ইতিবাচক দিকগুলোকে আত্মপরিচয় সন্ধানের ক্ষেত্রে অকাট্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। অন্য সভ্যতা হতে প্রথাদি গ্রহণ, পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত আলাপন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সমঝোতা– প্রতিটির ক্ষেত্রেই তিনি ইসলামি ভাবনাদর্শনকে মূলীভূত সারাংশ হিসেবে প্রয়োগ করতেন।

আল-ফারুকী পাশ্চাত্য ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাশ্চাত্য দর্শনে স্নাতক সমাপনের পর তিনি কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৪-৫৮ কালপর্বে ইসলামের গভীর জ্ঞানার্জনে নিমগ্ন হন। উত্তর আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হন; যেখানে ১৯৫৯-৬১ পর্যন্ত তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম অধ্যয়ন করেন। করাচির ইসলামি গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ইসলামি শিক্ষার অধ্যাপক হিসেবে তিনি তাঁর চাকরি জীবন শুরু করেন। এখানে তিনি ১৯৬১-৬৩ পর্যন্ত ছিলেন; অতঃপর ১৯৬৪ সনে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের ইতিহাস বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এক বছর পরে সিরাকুজ (Syracuse) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৮ সালে টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন; ১৯৮৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই কর্মরত ছিলেন।

ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে তাঁর লিখিত, সম্পাদিত ও অনূদিত পঁচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একশ'র বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তেইশটিরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপক এবং সাতটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-পত্রিকার সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। তিনি মুসলিম ছাত্র ও পেশাজীবীদের প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত করেছেন। তিনি American Academy of Religion-এর Islamic Studies Steering Committee -তে সভাপতিত্ব করেন। বহু বছর তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন।

মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে অন্তরঙ্গ মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজনে ফারুকী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেছেন। খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টজগৎ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে পাণ্ডিত্যের বিশালতা দিয়ে তিনি এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের Islamic Studies Institute-এ অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁর অন্যতম প্রধান গবেষণাকর্ম হলো খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা (Christian Ethics)।

খ্রিষ্টীয় দর্শনের ইতিহাস এবং খ্রিষ্ট ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে দু'বছরে প্রকল্প সম্পন্ন করা একজন মুসলমানের পক্ষে খুবই উচ্চাভিলাষী কাজ। যেখানে তাঁর সহকর্মী হিসেবে ছিলেন উল্লিখিত ইনস্টিটিউটের পরিচালক উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, চার্লস অ্যাডাম্স। স্টানলি ব্রিস ফ্রস্ট ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিভাগের ডিন। 'খ্রিষ্টীয় নীতি শাস্ত্র' ছিল অত্যন্ত কঠিন একটি গবেষণার কাজ। এর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে একজন অধুনা প্রশিক্ষিত মুসলিমের বিশ্লেষণ বিধৃত আছে। আল-ফারুকী তাঁর সৃষ্টিকর্মটির মধ্যে নিরলশ শ্রম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও ভাষার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো বিষয় তার মতামত ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে কারো কারো

বক্তব্য থাকতে পারে; সে জন্য তাকে দোষারূপ করা ঠিক হবে না। কেননা, এর উপর কোনোরূপ গবেষণা না করে সরলতার সাথেই তিনি তার দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৯৬৭ সালে তার Christian Ethics গ্রন্থটি প্রকাশের পর আমৃত্যু অন্যান্য বিশ্বধর্মের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মের একজন শক্তিশালী ব্যাখ্যাকারক ছিলেন। Islam and Other Faith গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধসমূহ থেকে ফারুকীর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে আগ্রহ এবং এর সাথে তিনি যে সারাজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা বুঝা যায়। আল-ফারুকী ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং এগুলোতে তার অংশগ্রহণ ছিলো খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। ইসলামি ধর্মতত্ত্বের সক্রিয় কর্মী ও খ্রিস্টধর্মসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইসলামি ধর্মদর্শনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আল-ফারুকী যুগপৎ পাশ্চাত্য শিক্ষাগত ও ধর্মীয় বলয়ের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও সম্মানিত জন হিসেবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর রচনাকর্ম, বক্তৃতা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের ভূমিকার ক্ষেত্রে চার্চের বিশ্বসভা, চার্চের জাতীয় কাউন্সিল, দি ভেটিকান এবং আন্তঃধর্মীয় শান্তিসংঘ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তিনি ১৯৭৭-৮২ তে আন্তঃধর্মীয় শান্তি-সংঘের সহ-সভাপতি ছিলেন। উপর্যুক্ত কার্যক্রম তাঁকে বিশ্বধর্মের সংলাপের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান এক সম্ভাবনাময় মুসলিম কর্মীপুরুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলো। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সামাজিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তাঁর রচনাকর্ম মূলনীতি ও ভিত্তি প্রনয়ণে সহায়তা করেছে। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস অধ্যয়ন করে ইসলামি ধর্মতত্ত্বকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফারুকীর এ প্রয়াস ইতিবাচক। এই বিশ্বাস টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। যেখানে ফারুকী মুসলিম ছাত্রদের অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মের বিষয়ে গবেষণায় প্রণোদিত করতেন।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমানের চেয়েও কখনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বিশ্বায়ন ও ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিশালী উপস্থিতি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ককে সভ্যতাগত সংলাপের ক্ষেত্রে প্রণোদিত করছে। ইসমাইল আল-ফারুকী এ ক্ষেত্রে একটি আদর্শকে তুলে ধরেছেন; যা সর্বব্যাপিতা পাচ্ছে। ফারুকীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কখনো দ্বিমত সৃষ্টি হলেও আন্তঃসভ্যতাগত সংলাপের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি গভীরতম ছিল। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তার উৎস সম্পর্কে জানতেন বলে এগুলো সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনায় সাবলীল ছিলেন।

ড. ইসমাইল আল-ফারুকী ছিলেন অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি দৈশিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তাঁর চিন্তাকে ব্যাপ্ত করেছেন। প্রাক্তন ছাত্র ও প্রথম পিএইচ.

ডি. গবেষক হিসেবে আমার তাঁর এবং লামিয়া আল-ফারুকীর সাথে ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে সম্পর্কিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রাজ্ঞতা ইসলামি বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। তিনি ছিলেন সৃষ্টিশীল, পরিকল্পক, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রভাব সৃষ্টিকারী ও মনোরম ব্যক্তিত্বময়। ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন তাঁর বিশ্বাস, বৃত্তি জীবন চাঞ্চল্যকে গঠন করেছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে মূল্যায়ন করা খুব কঠিন। তথাপি ফারুকী সম্পর্কে এভাবে বলা যায় যে, তাঁর জীবনব্যাপী বাসনা ছিল আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণতা দানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর সত্তাকে অনুধাবন ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা– ইসমাইল আল-ফারুকী আসলে ছিলেন প্রকৃত মুজাহিদ বা জিহাদকারী।

ওয়াশিংটন, ডিসি
২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

জন এল. ইসপজিটো
অধ্যাপক, ধর্মতত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
পরিচালক, মুসলিম খ্রিষ্টান সমঝোতা কেন্দ্র
জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

সূচি

প্রস্তাবনা xiii

ভূমিকা xvii

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়
ইসলামে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সারকথা ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্বর্গীয় অতীন্দ্রিয়তা এবং এর প্রকাশ ৪৫

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং স্বর্গীয় অতীন্দ্রিয় ধারণার প্রাথমিক বিকাশ ৪৭
ইসলাম-পূর্বযুগে স্বর্গীয় ভাবনার অবস্থা ৪৭
মেসোপটেমীয়া ও আরব ৪৭
হিব্রু ও তাদের পরম্পরা ৪৮
খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ৫১
১. ইহুদি উৎস ৫১
২. আধ্যাত্মিক খ্রিষ্টান সংক্রান্ত বিষয়ের উৎস ৫৪
৩. রহস্যময় ধর্মরাজির উৎস ৫৬
ইসলামের উৎকর্ষগুণ: শ্রেষ্ঠত্ব ৬০
মানুষের উপলব্ধির ক্ষমতা ৬০
মানুষের ভুল বুঝার ক্ষমতা ৬৩
দৃশ্যমান শিল্পে অলৌকিকত্বের অভিব্যক্তি ৬৬
রসসাহিত্যে অতীন্দ্রিয়বাদ ৬৯
পরিবর্তিত ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে রসসাহিত্যকে সংরক্ষিত রাখা ৭২

তৃতীয় অধ্যায়
বৈশ্বিক আন্তঃধর্মীয় নির্ভরতায় ইসলামের ভূমিকা ৭৭
১ আদর্শগত সম্পর্ক ৭৮
ক. ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম ৭৮

খ. অন্যান্য ধর্ম ৮১
গ. মানুষের সাথে ইসলামের সম্পর্ক ৮৩
২ বাস্তব সম্পর্ক ৮৬
ক. ইহুদি সম্প্রদায় ৮৭
খ. খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ৮৮
গ. অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় ৮৮
৩ উপসংহার: বৈশ্বিক ধর্মীয় আন্তঃসম্পর্কে ইসলামের অবদান ৯০

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলাম ও খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হিব্রু ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা ১০১

দ্বিতীয় পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম ১১৫
১. পৃথিবীতে মানবিক বিশ্বজনীনতার প্রয়োজনীয়তা ১১৫
২. ইসলামের শিক্ষা ১১৬
ক. সারকথা ১১৬
খ. অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ১১৭
গ. মানবতত্ত্ব ১২০
ঘ. প্রাকৃতিক বা সহজাতধর্ম ১২০
ঙ. বিশ্বধর্মবোধের সহজাত ঐক্য ১২২
৩. সমাজতত্ত্ব ১২২
ক. ইতিহাস ১২৫
৪. আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ভিত্তি: ইসলামি মানবতাবাদ ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
ধর্মের ইতিহাস: খ্রিষ্টীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি এবং মুসলিম–খ্রিষ্টান সংলাপ ১৩৭
১. ধর্মের ইতিহাসের স্বরূপ ১৩৭
২. তথ্য সংগ্রহ ১৩৭
ক. ইসলামের ক্ষেত্রে ১৩৮
খ. ইহুদিদের ক্ষেত্রে ১৩৯

গ. খ্রিষ্টতত্ত্বের ক্ষেত্রে ১৪০
৩. তথ্য প্রণালীবদ্ধকরণ ১৪০
৪. বিচার বা মূল্যায়ন ১৪২
ক. বিচারের প্রয়োজনীয়তা ১৪২
খ. বিচার বিশ্লেষণের যোগ্যতা ১৪৪
গ. বিচারের সম্ভাব্যতা ১৪৫
৫. খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় ধর্মের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ১৪৮
৬. খ্রিষ্টান-মুসলিম সংলাপে ধর্মের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য ১৫২
ড. আল-ফারুকীর জবাবে বার্নার্ড ই. মেলাণ্ড ১৫৫

সপ্তম অধ্যায়
জীবন চলার ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও সমঝোতার ব্যাপারে দুটো ধর্মের সাধারণ ভিত্তি ১৬৯
প্রথম: সাধারণ ভিত্তি ১৬৯
১. পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ১৭২
ক. খ্রিষ্টীয় সচেতনতার রাজ্য: ১৭২
২ মুসলিম সচেতনতার রাজ্য ১৭৪
ক. খ্রিষ্টীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রশ্ন ১৭৪
খ. খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রশ্নে ১৭৫
গ. খ্রিষ্টীয় প্রাচ্যবাদের প্রশ্নে ১৭৬
৩ জনগণকর্মের রাজ্যে ১৭৭
ক. জ্ঞানগত সমস্যা ১৭৭
খ. ব্যক্তিগত নৈতিকতার সমস্যা ১৭৮
গ. পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যা ১৮০
ঘ. জাতিগোষ্ঠীগত সমস্যা ১৮১
ঙ. বস্তুবাদের সমস্যা ১৮১
চ. ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয় প্রতিযোগিতা ১৮৩
ছ. সবকিছুতেই অবিশ্বাসী মনোভাব ১৮৪

অষ্টম অধ্যায়
ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম: দীর্ঘ আলোচনা বা সংলাপ ১৯১
সারাংশ ১৯১

সংলাপের জন্য তিনটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য ১৯১
বর্তমান সমস্যা ১৯৩
সংলাপের পদ্ধতিবিদ্যা ১৯৫
সংলাপের বিষয় ১৯৯
মূর্তকরণের ক্ষেত্রে বিষয়ের দ্বান্দ্বিকতা ২০০
ক. একজন আধুনিক মানুষ ও নিষ্পাপতার অবস্থা ২০০
খ. মঙ্গলকার্য করার পেছনে যুক্তি ২০২
গ. কৃতকর্ম ও মুক্তি-চেতনা ২০৪
প্রত্যাশার ক্ষেত্র ২০৫
ক. ক্যাথলিক চার্চ ২০৫
খ. প্রোটেস্ট্যান্টস ২০৬

নবম অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকারঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত ২১৭
ভূমিকা ২১৭
বিশ্বজনীন ধর্মাবলি ২১৭
জাতিভিত্তিক ধর্মাবলি ২১৮
ইসলামের অবস্থান ২১৯
সর্বাধিক মঙ্গলে অংশগ্রহণের জন্য অবিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান ২২১
অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা ২২১
বিশ্বাস করা না করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ২২৩
ক. অমুসলিমদের প্রভাবিত হওয়া কেন প্রয়োজন ২২৩
খ. প্রভাবিত না হওয়ার অধিকার ২২৪
গ. অন্যকে প্রভাবিত করার অধিকার ২২৫
ঘ. স্বাধীনতার বৈচিত্র্য ২২৬
ঙ. তাদেরকে চিরস্থায়ী করার অধিকার ২২৭
চ. কাজ করার অধিকার ২২৮
ছ. আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের অধিকার ২২৮
উপসংহার ২২৯

তৃতীয় পর্ব

দশম অধ্যায়
ইসলামি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ২৩৩
১. দাওয়াতের পদ্ধতিতত্ত্ব ২৩৩

ক. দাওয়াত জোরজবরদস্তিমূলক নয় ২৩৩
খ. দাওয়াত কোনো হালকা মনস্তাত্ত্বিক অভিষিক্তকরণ নয় ২৩৫
গ. দাওয়াতি কাজ মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ের প্রতিই নির্দেশিত ২৩৫
ঘ. দাওয়াত: যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তার উপস্থাপন ২৩৬
ঙ. দাওয়াত: যৌক্তিকভাবেই জরুরি প্রসঙ্গ ২৩৬
চ. দাওয়াত হলো আল্লাহর স্মরণ ২৩৭
ছ. দাওয়াত: বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠত্বের উপকরণ ২৩৮
২. দাওয়াতের বিষয়বস্তু ২৩৯

একাদশ অধ্যায়
পাশ্চাত্যে দাওয়াত: প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা ২৪৩
১. ইসলামের বিস্তৃতির চমৎকারিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ২৪৩
২. পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াত্ব ২৪৩
ক. মানুষ ও প্রকৃতির জ্ঞানের রাজ্যে ২৪৩
খ. ধর্মের সাম্রাজ্যে ২৪৫
গ. ইসলামের ইতিবাচক আবেদন ২৪৬
৩. হিজরতকারী বা অভিবাসিত মুসলমান ২৪৮
ক. নতুন মুহাজির: অভিবাসিত মুসলমান ২৪৮
খ. মুসলিম অভিবাসীদের ইসলামের প্রতি নেতিবাচকতা ২৫০
গ. অভিবাসীদের ভয়ঙ্কর মূল্য প্রদান ২৫১
ঘ. আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্যকার হারানো মুহাজিরিন বা অভিবাসী ২৫২
৫. ইসলামি দাওয়াতের উপকরণ হিসেবে মুহাজির বা অভিবাসীদের অবস্থান ২৫৪
১. অস্থায়ী ছাত্র ২৫৭
২. স্থায়ী বসবাসকারী ২৫৮
৬. দাওয়াত ও বিশ্বব্যবস্থা ২৬০

ভূমিকা

ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী স্বীয় মতাদর্শকে সঠিক প্রমাণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নিজেকে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে নিয়োজিত করেন। ইসলামি জগতের বুদ্ধিজীবীদের যেসকল বক্তব্য তিনি যথেষ্ট মনে করেননি বা তাঁর কাছে যেসকল বক্তব্য স্পষ্ট মনে হয়নি, সেগুলোকে নবায়ন করে চিন্তার দোদুল্যমানতা দূর পূর্বক সত্যনিষ্ঠ তথ্যদর্শনকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ফারুকীর জীবনে বিশেষ করে তাঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। তিনি ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতেন। বিষয়টি অন্যরা সহজেই বুঝতে পেরেছিল। অধ্যাপক এইচ. এ. আর. গিব-এর পত্রের জবাবে ফারুকী লিখেছেন "আপনার কথা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, আমি ইসলামকে আমার জীবনের পথ নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করেছি"।[১] ফারুকীর সমগ্র জীবন ইসলামের দর্শনকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। এমনটিই ছিল তাঁর শিক্ষাগত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আল-ফারুকী ১৯২১ সালের ১ জানুয়ারি ফিলিস্তিনের জাফ্ফাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদ আল হুদা আল-ফারুকী ফিলিস্তিনের একজন যোগ্য বিচারক ও সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। ফারুকী সম্ভ্রান্ত ও প্রাজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর শিক্ষার ভিত্তি সুগভীরভাবে নির্মিত হয়েছিলো। তাই তিনি দেশের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সালে দেশে ফেরার পর ফারুকী ফিলিস্তিন সরকারের গ্যালিলির জেলা গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের বিভক্তিতে স্বপরিবারে তিনি উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীরভাবে বেদনার্ত করেছিল; যা তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ভূমিকা পালন করেছে। তাই পরবর্তী জীবনের লেখালেখিতে স্বীয় মাতৃভূমি, জনগণ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে।

ফারুকী অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র যান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল: 'মঙ্গল সম্পর্কিত বিবেচনাবোধ: মূল্যবোধের অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব'। তিনি ১৯৫২ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ফারুকী ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের উত্তরাধিকার অনুধাবনের লক্ষ্যে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৪-১৯৫৮ অধ্যয়ন করেন। তিনি অধ্যাপক ক্যান্টওয়েল স্মিথের আমন্ত্রণে এক বছর পরে মনট্রিলস্থ ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব অনুষদে যোগ দেন এবং সেখানে তিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন।

বর্তমান গ্রন্থে ফারুকীর দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দর্শন আমরা অনুধাবন করবো। যদিও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। এতে ইবরাহিম আ.-এর পূর্বযুগ বিশেষ অনুধাবনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মেসোপটেমিয় ও মিশরীয় সভ্যতার ধর্ম সম্বন্ধে ফারুকীর দর্শনের আলোচনা থেকে এ গ্রন্থের সূচনা। তিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের কেন্দ্রিকতায় সমাজ ও সংস্কৃতির আদর্শ পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর উপর্যুক্ত সভ্যতার মানুষ এ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। এই অঞ্চলের প্রতি তাঁর মনোযোগের কারণ মূলত: নিকটপ্রাচ্যের ভৌগোলিক, জাতিক ও ভাষিক বৈশিষ্ট্য। ফারুকীর সার্বিক দর্শনের মূলে এতদ্‌অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মের আন্তঃসম্পর্কের চিরন্তনতার পরিদৃশ্যমানতা (Phenomenon) ক্রিয়াশীল ছিলো। আরব-উপদ্বীপের সংস্কৃতি, ইতিহাস, চিরন্তন মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়/পারস্য বিশ্বাসের (মানবজাতির ত্রাণকর্তা, মৃত্যু, বিচার, আত্মার পরিণাম ও শেষ গন্তব্য) স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন। আরবরা এরূপ বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। হজরত ইবরাহিম আ.[২] আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কেন পথিকৃতের দাবিদার - তাও তিনি প্রমাণ করেন। ইবরাহিম আ.-এর বিশ্বাস ও চর্চা তাঁকে একত্ববাদিতার মূলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা দিয়েছে তথা তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। এ মতে বিশ্বাস তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্প্রদায়চ্যুত করার অন্যতম কারণ ছিল। ধর্মীয় কারণে তিনি উর-এর নির্যাতিত ব্যক্তি ছিলেন। ফলশ্রুতিতে তাঁকে ২৬-২৪ খ্রিষ্ট. পূর্বাব্দে সময়ের মেসোপটেমিয় রাজধানী শহর উর ত্যাগ করতে হয়। এখান থেকে তিনি হাজেরাকে নিয়ে আরব উপদ্বীপে গমন করেন।

মেসোপটেমিয় ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন দেবদেবী প্রচলিত ছিল। মেসোপটেমিয়রা স্বর্গ, বাতাস, পাহাড় ও সুস্বাদু পানি–প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র দেবতায় বিশ্বাস করতো। চন্দ্র, সূর্য ও তারকাকেও তারা দেবতা আখ্যা দিত। আন (An) বা আনুম (Anum) ছিল স্বর্গের দেবতা এবং অন্যান্য দেবতার পিতা। বৃষ্টিকে তার বীর্য মনে করা হতো। যা পৃথিবীকে সন্তানসম্ভবা ও ফলে ফুলে সুশোভিত করতো। ইনলিলও ইয়াকি (Eaki) ছিল যথাক্রমে বায়ু ও ভূগর্ভস্থ সুস্বাদু পানিয়ের দেবতা। কিন্তু, ব্যাবিলন শহরের দেবতা মারদুক নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। তৎকালে তাকে দেবতাদের স্থায়ী রাজা হিসেবে গণ্য করা হতো। এক্ষেত্রে আল-ফারুকীর বিশ্লেষণ ছিল চিত্তাকর্ষক। এসব দেবতা সম্পর্কে ফারুকীর মন্তব্য হলো: এ জনপদের মানুষ নিজেদেরকে অতীন্দ্রিয় দেবতার দাস হিসেবে মনে করতো। মেসোপটেমিয়াবাসীদেরও অনেক দেব-দেবী ছিল। তৎকালে জনগণকে তাদের দাস হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। দেবতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা প্রকৃতির কোনো বিশেষ কিছুর প্রতি তাদের পক্ষপাত ছিল না। দেবতার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল

কর্মমূলক–আপতিক, আংশিক, দৈবক্রমগত; সামগ্রিক নয়। সেজন্য তাদেরকে মুশরিক বা আল্লাহর সাথে অংশীদার দাবিকারী বলা সঙ্গত নয়। ফারুকীর বিশ্লেষণ কঠিন মনে হলেও তাঁর চিন্তার বৈশিষ্ট্যসমূহে অনেকে আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে পড়বেন।

মেসোপটেমিয়দের শিরকমুক্ত করার পর আল-ফারুকী উক্ত সভ্যতার জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশরীয় দেবতা-সংক্রান্ত ধারণার প্রতিতুলনা করেন। মিশরীয়রা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। ফারুকীর মতে, মেসোপটেমিয়রা আল্লাহর তাৎক্ষণিক উপস্থিতি প্রকৃতি নিযুক্ত করে বিবেচনা করে। আল্লাহ সম্পর্কে মিশরীয়দের ধারণা প্রকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যস্থতায় অনুভবযোগ্য। কিন্তু, মেসোপটেমিয়দের আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা নিহিত অবস্থায় থাকে; যদিও তা কখনোই কোনো কিছুর সমান নয়; বা কোনো কিছুর দ্বারা পরিবর্তনসাধ্য নয়'।[৩] ফারুকীর অভিপ্রায় ছিল আরবীয় জীবন ও সংস্কৃতির নিবিড় অধ্যয়নপূর্বক ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আরবত্ব (Arabism) বিনির্মাণ করা। তিনি মেসোপটেমিয়দেরকে পথভ্রষ্ট বা বিচ্যুত একেশ্বরবাদী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের ফলে তাদের মধ্যে প্রকৃত একত্ববাদের 'পুনরাবিষ্কার' ও 'পুনরুদ্ধার' ঘটে। গ্রিক ও রোমান বিশ্বাসের মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক এই রুঢ় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ করেন। একদা আরব উপদ্বীপে আল্লাহর একত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত ছিল; অতঃপর আরবতত্ত্ব নিকটপ্রাচ্য ও প্রাচীন মেসোপটেমিয় অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পায়। তিনি আরবীয়-অঞ্চলকে 'সেমেটিক সভ্যতা' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আল-ফারুকী ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে আরবতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর ত্রিস্তরের বদ্ধধারণা আরবতত্ত্ব-উদ্ভূত। 'আরব জাতীয়তাবাদ' গত দুইশত বছরের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক জীবনের ফলস্বরূপ হলেও; আরবত্ব হাজার বছরের পুরনো। ফারুকীর প্রথমার্ধের রচনায় সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে আরবত্ব সংজ্ঞায়নের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়; তাঁর পরবর্তী সময়ের রচনায় আরবত্ব অ-আরবীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি আরবত্বকে 'আরবীয় মূলধারা' হিসেবে উল্লেখপূর্বক এর প্রবাহকে শক্তিশালী ও গতি প্রদান করেন। তন্মধ্যে অবশ্যই 'আরবীয় ভাষা' সংস্কৃতি ও ধর্ম' অঙ্গীভূত থাকে। আরব্যতত্ত্বকে চারটি পারম্পর্যমূলক ধারা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন। চারটি ধারা হলো: সপ্তম শতাব্দীর মুসলিম, পনেরশ' খ্রিষ্টপূর্বের অ্যারামিয়ান (সিরীয়-সভ্যতা), দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহস্র খ্রিষ্টপূর্বে আমোরাইট (ব্যবিলনের প্রথম সভ্যতা: মেসোপটেমিয়, ফিলিস্তিন ও সিরিয়া অঞ্চলের) এবং চতুর্থ ও পঞ্চম সহস্র খ্রিষ্টপূর্বে আককাডীয়–সভ্যতা। এসব তথ্যাদি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ফারুকী বলেন যে, আরবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলধারা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি ঐতিহাসিক নির্মিতি সৃষ্টি করেছিল'।[৪]

আল-ফারুকী মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রিকতায় তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের আরবত্ব ব্যাখ্যা করেন। ভৌগোলিক অঞ্চল ও ইব্রাহীম আ.-এর ধর্মের প্রেক্ষাপট থেকে তিনি কথা বলেছেন। যদিও ইতিহাসে এ বিষয়ক তথ্যাদি অত্যল্প। তিনি ইহুদি ধর্মতত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রগতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে ইহুদি সময়পর্বের সূচনা হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। ফারুকী হিব্রু ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখান। একটি হলো 'নির্বাসন-পূর্ব' ইহুদিধর্ম ও অন্যটি 'নির্বাসন-উত্তর' হিব্রু ধর্মাচরণবাদ। 'নির্বাসন-উত্তর' দৃষ্টিভঙ্গি ঐশি বাণীর উৎকর্ষের ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করে। নবি-রসুলদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ক্রমশ প্রবলভাবে তিরোহিত হয়। নবি-রসুলদের ধর্মীয় ধারাবাহিকতা বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে ইহুদি পণ্ডিতদের ঐতিহ্য দায়ী। উপর্যুক্ত ধর্মের জনগণ ইহুদিবাদী একরেখিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিহত করতে চেষ্টা করেনি। ফারুকীর মতে, ইহুদিদের নির্বাচনতত্ত্ব ছিল নৈতিকভাবে ভঙ্গুর।

আরববাদ সম্পর্কে ফারুকীর মতবাদের ইতি-নেতিবাচক বক্তব্য আছে। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ডিন স্টেনলি ফ্রস্ট ফারুকীকে আরবত্ব প্রসঙ্গে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, কোন অধিকারে আপনি সমগ্রের একটি অংশকে নির্দিষ্টতাবাচক উপাদানে সন্নিবদ্ধ করেন? আরব কি শুধু একটি অংশ নয়? কারণ সেমিটিক শব্দ তো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু আরব্য-চিন্তা প্রবাহ বললে বিতর্ক হতে পারে। উপর্যুক্ত বক্তব্য ফারুকীর চিন্তাতত্ত্বে আরবীয় চেতনায় তীক্ষ্মতা সৃষ্টি করেছে। স্ট্যানলি ফ্রস্টের তীব্র অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ফারুকীর নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য:

> আমি সেমিটিকের তুলনায় আরবকে উৎকর্ষ অতিক্রমী সংবেদনার নামান্তর মনে করি। 'অনেকের মধ্যে এক' বুঝাতে আরব উপাদানকে ব্যবহার করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়: ইহুদিবাদ হলো ইহুদিদের ধর্ম, যারা যুদা-র অধিবাসী। কিন্তু আরববাদ ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক ও মতাদর্শগতভাবেও আরবীয়। কারণ যুদা নিবাসি ইহুদিরা আরবের অংশ। ইহুদি ঐতিহ্য অন্য ধরনের উপাদান যেমন ফিনিসীয় ভাষা ও সংস্কৃতি, আনানাইট (Anaanites) ও প্রাচীন মাইনাইটের (Mainites) মতো উপচার-সমৃদ্ধ। কিন্তু তারা সকলেই আরবীয়র অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত আরব-ই আমার দৃষ্টিতে সেমিটেজ গোষ্ঠীভুক্ত (Semites)। কিন্তু এ সেমিটিক ধারণা পাশ্চাত্য থেকে ঋণকৃত। সেমাইট- জনগোষ্ঠী সেমিটিক বলে পরিচয় দেয় না বলেই আমার বিশ্বাস। তারা কি নিজেদের আরব হিসেবে পরিচয় দেয়? কিন্তু আরববাসীরা (আরব-উপদ্বীপভুক্ত লোকজন) তা করে।

> আরবীয়রা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর আদি উৎস বলে তারা একটি সামগ্রিক নাম গ্রহণ করতে পারে। ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক ও মতাদর্শগত এমন তথ্য-প্রমাণ আমার জানা নেই যে, একজন আরব নিজেকে কেনানি, ফিনিসীয়, ব্যাবিলনীয় বা যুদা-বাসী বলে পরিচয় দেয়। শুধু সেমাইট' ধারণার ক্ষেত্রে এ ধরনের দাবি থাকতে পারে; তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এটিকে বাগাড়ম্বরপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঊনিশ শতকে ইহুদি ঐতিহ্য থেকে সেমিটিক শব্দ দ্বারা সর্বগ্রাসীতাকে বুঝাতে চেয়েছেন, তবে আমি কেন 'আরবীয়' ধারণা গ্রহণ করবো না যা প্রজ্ঞাবাহী বিশ শতকের একটি ধারণা অপেক্ষা তা অধিক সর্বগ্রাসী ব্যাপার হিসেবে চিহ্নিত এবং যে দাবিটি অধিক সঙ্গত?[৫]

ফারুকী'র আরবসংক্রান্ত এ নতুনতর প্রাজ্ঞ ব্যাখ্যাকে স্ট্যানলি খ্রিষ্টতত্ত্বের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। খ্রিষ্টতত্ত্বকে ইহুদির একচেটিয়া গোষ্ঠীবাদ এবং আরব্য-প্রবাহের সঙ্গে হিব্রুদের পরিব্যাপ্তি থেকে এটিকে আরবের দ্বিতীয় প্রধান উপকরণ হিসেবে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। যিশু খ্রিষ্ট বা ঈসা আ.-এর বাণী হিব্রু সমস্যার সমাধানের ভাষ্য ছিল। যিশু ইহুদি ছিলেন। এজন্য তিনি তাদের মৌলচেতনা ও প্রভাবের ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন। ইহুদিরা যিশুকে প্রত্যাদেশবহনকারী একজন মানুষ হিসেবে দেখেছেন।

তিনি ধর্মপ্রচার স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম শুরু করেন। ফারুকীর মতে, ইহুদিরা মনে করেছে প্রভু তাদের হিব্রু ঐতিহ্যের বিশেষত্ব নিরসনপূর্বক একটি নতুন চেতনা ও নৈতিকতায় জাগ্রত করতে চান। এ ক্ষেত্রে আল-ফারুকীর মন্তব্য হচ্ছে, সেজন্য ইহুদিরা যিশুর কর্ম ও জীবনের ইতি টানতে প্ররোচিত হয়েছে। যিশু ও তাঁর বাণী মানবজাতির জন্য অপরিহার্য ছিল। যিশু ইহুদিদের ক্ষেত্রে উৎসাহী ছিলেন: যেহেতু তারা মানবজাতির অংশ এবং সর্বোপরি তিনি তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করছেন; তাই তাদের ভাষাই ছিল যিশুর মাতৃভাষা। ঈসা আ. বিশ্বে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কথা প্রচার করেছেন। তিনি বলেন, স্রষ্টা হলেন সমস্ত মানদণ্ডের মৌল সত্তা। প্রতিবেশিদের প্রতি ভালোবাসার বিষয়কে হিব্রুরা ঈশ্বরের প্রতি নিন্দামূলক মনে করতো। তাদের কাছে আল্লাহর ভালোবাসা ছিল ইসরাইলের আল্লাহকে ভালোবাসার সমতুল্য। যিশুর বাণীর জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা ইহুদিদের অন্যতম প্রবণতা ছিল। যিশুর শিক্ষা তাদের দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। যিশু সম্পর্কে ইহুদিদের সমালোচনা ছিল খুব তীব্র ও আক্রমণাত্মক। যিশুর শিক্ষা ইহুদিদের মৌলধারণা ও চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এই সমস্ত ধারণা ক্রমশ গ্রিক চিন্তাদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

ফারুকীর বিশ্লেষণ ছিলো: যিশুর শিক্ষার উপাদানগুলো ইহুদি ঐতিহ্যের অন্তর্গত এবং আল্লাহর প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাসকেন্দ্রিক। আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ওল্ড টেস্টামেন্টের (বাইবেল: পুরাতন নিয়ম) প্রধান একটি চেতনা; এটি থেকে খ্রিষ্টবাদের সৃষ্টি যেখানে সত্তাগত চেতনার মৌলসারবস্তু বিদ্যমান। ফারুকীর মতে, খ্রিষ্টধর্মের সারমর্ম মূলত: নবি আমোস ও তাঁর ভাববাদী দর্শনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর এই মতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: হিব্রু ইতিহাসের সাথে খ্রিষ্টধর্মের বিযুক্তকরণ, যেখানে মানবমুক্তির প্রতি অতি গুরুত্বারোপ এবং এটিকে পরিশোধিত 'পরিপূর্ণ নৈতিক', 'পাপহীন জন্মে'র সাথে সম্পর্কিত করা। ফারুকীর খ্রিষ্টবাদ স্রষ্টার ধারণার দূরবর্তীতাকে অস্বীকার করে। ঈসা আ. কে তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছেন, যা ছিল ইহুদি জাতিতত্ত্ববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ফারুকীর লেখনীতে ধর্মের ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ধারণাকে তিনি ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সমন্বয়প্রবণ বিবেচনা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে যার প্রভাব আরবের প্রায় সব গোত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হানিফদের বিশুদ্ধতা নির্দেশক বৈশিষ্ট্য ছিল: তারা আল্লাহর অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতা (শিরক) বিরোধী জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠ, নৈতিকভাবে স্বতন্ত্রবাদী। ভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের বিশ্বাস ও অনুশীলন ইহুদি-ঐতিহ্যের নিকটবর্তী ছিলো। এরূপ ঐতিহ্য সিরিয়- সভ্যতা প্রভাবিত এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এজন্য তারা ছিল অবহেলিত ও সমাজে অগুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তাদের মরুভূমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আশ্রয়ে যেতে হয়েছে। ফারুকীর মতে, এটি তাদের এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের (Hanafism) প্রবাহকে স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধতা প্রদান করেছে। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাবের পূর্বে হাদরামাউত এবং হিজাজে ধর্মপ্রচারকারী নবি হুদ আ., সালিহ আ. ও শোয়াইব আ. আরবীয় উপদ্বীপে ইবরাহিম আ.-এর ধর্মের আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন। সেখানকার জনগণ উপর্যুক্ত তিন নবিকে অগ্রাহ্য করায় সেখানে আল্লাহর সাথে অংশীবাদের ধারণা (শিরক) প্রভাব বিস্তার করে।

আরব্যবাদের উৎকর্ষের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ জারি হয়েছিল। আরব–জাগরণের প্রথমপর্বকে তিনি ইহুদিবাদ, দ্বিতীয়পর্বকে খ্রিষ্টবাদ এবং তৃতীয়পর্বকে আরব্যবাদের প্রবাহ ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত করেন। তবে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে তিনি ইসলামি পর্বকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। নতুন মূল্যবোধ মানুষের কাছে অপরিচিত হতে পারে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু ধারাবাহিক ও সমন্বিত ইতিবাচক মূল্যবোধের পতাকাবাহী; তাই তিনি বিশ্বব্যাপী

ইসলামকে প্রভাবশালী বিশ্বাস হিসেবে উপস্থাপন করেন। আরবত্বের মধ্যে নতুন মূল্যবোধ সন্ধান করতে হলে তা যৌক্তিকভাবে হবে 'ইসলামিক'। এক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধকে সম্প্রদায়ের (উম্মাহ) উত্তরাধিকারের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত করে উপস্থাপন করতে হবে।

মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাধীনতা ভোগ করে। আল-ফারুকী প্রবর্তিত প্রগতির ধারণা হলো, নবিগণ হলেন মূলত: সতর্ককারী, স্মরণকারী ও সংস্কারক। তিনটি মূলধর্মের (ইহুদি, খ্রিষ্ট ও ইসলাম) সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ইবনে হাজমের মতাদর্শ থেকে ফারুকী প্রভাবিত হয়ে থাকলেও; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে মোহাম্মদ আবদুহু ইবনে হাজমের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন মাত্রিকতায় বিবেচনা করেছেন। মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে ফারুকী তিন ভাগে বিভক্ত করেন: তিনটি ভাগ হলো: প্রথমত, শৈশবকাল: যখন শিশুরা প্রচণ্ড নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়ত যুগসন্ধি অবস্থা: যার সঙ্গে মুসা আ.-এর নীতির সম্পর্ক বিদ্যমান; যখন মানুষ তার আবেগ ও অনুভূতির ওপর নির্ভর করে এবং যা হলো খ্রিষ্টতত্ত্বের যুগ। তৃতীয়ত, চিন্তার পরিপক্কতার যুগ: যখন মানুষ যুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল থাকে–এটিকে তিনি ইসলামের যুগ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আল-ফারুকী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এ প্রস্তাবনাকে নাকোচ করে দিয়েছেন যে ইসলাম ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। এটিকে তিনি নিছক সহাবস্থান বলেছেন এবং বলেছেন প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিরা ঋণ গ্রহণকে সমর্থন করেন না। দুটো আন্দোলনের মধ্যে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারের চেয়ে বরং পরবর্তী মতবাদে এর ধারাবাহিকতা প্রবাহিত হয় এবং প্রথমটির সংস্কার সাধিত হয়। তিনি চিহ্নিত করেছেন: পণ্ডিতগণ বলেন না যে- ইহুদিবাদ থেকে খ্রিষ্টবাদ; হিন্দুত্ব থেকে বৌদ্ধধর্ম কিংবা ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্ট্যান্ট এসেছে। যদিও ইসলাম মনে করে যে, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম ইসলাম ধর্মের মতোই একই উৎস থেকে প্রণীত কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম তাদের প্রণেতাগণ কর্তৃক বিকৃত হয়েছে।

ফারুকী তাঁর প্রগতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। যে পদ্ধতিতে ইহুদি, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্মকে বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তার প্রস্তাবিত পদ্ধতি হলো, খ্রিষ্টীয় নৈতিকতা এবং এর প্রভাবশালী চিন্তার ঐতিহাসিক ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। যেটিকে তিনি অধিধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন: তুলনাকারী ধর্ম দু'টির তুলনাকারীদের মতামত অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে। সত্যের অনুসন্ধান হলো আত্মজিজ্ঞাসার মূল বিষয়। এক্ষেত্রে গবেষক একজন শ্রোতা বা দর্শক অপেক্ষা মূল্যবান। গবেষক এভাবে তাঁর আত্ম-বিশ্লেষণ ও বৈশ্বিক

পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ফারুকী প্রদত্ত ৬টি নীতি নিম্নরূপ:

ক. আদর্শ ও বাস্তবতা দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। নৈতিকতার নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সত্য ও মূল্যবোধও পৃথক বিষয়। এ দ্বৈততা সত্য না হলে সত্য ও মূল্যবোধ অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয় না। তবে একটি সত্য দিয়ে অন্য সত্যকে বিচার করলে কোনো ভিত্তি নির্মিত হয় না।

খ. আদর্শ প্রকৃতার্থে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু আদর্শ প্রপঞ্চ নীতিমালার একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তাই এটি বাস্তবতার বিন্যাস ও গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত; বাস্তবতা গুরুত্ববহ বা গুরুত্বপূর্ণ কি–না; এটি তা বিচার করার মানদণ্ড নির্দেশক।

গ. বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শের সম্পৃক্ততা একটি নির্দেশনা। ফারুকী সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, আদর্শের সমগ্রসত্তা বাস্তবতার প্রকৃতসত্তার সঙ্গে বিজড়িত। যথার্থভাবে বাস্তবতাকে বিচার করতে হবে। আদর্শের বিষয়টি অধিক গুরুত্ববহ; বাস্তবতা যেটিকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনয়ন করবে।

ঘ. প্রকৃত বাস্তবতা নিকৃষ্ট হতে পারে না, কেননা বাস্তবতার বিষয়টি মঙ্গলজনক। এ বিশ্ব মঙ্গলময়, এতে প্রবেশ ও অন্তর্ভুক্ত থাকার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ. বিশ্বকে মূল্যায়ন ও গঠন করার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও কাঠামোর বিনির্মাণে আদর্শের এমন নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন; যাতে মূল্যমান অনুধাবন সম্ভবপর হয়। সেজন্য বাস্তবতার বিষয়টি অবশ্যই বিগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চ. বিশ্বজগতের পরিপূর্ণতার বিষয়টি মানুষের জন্য বোঝাস্বরূপ। মানুষের মধ্যে বাস্তবতার মূল্যবোধগত আদর্শটি নিহিত থাকে। বাস্তবতায় প্রবেশের সেতু স্বরূপ মানুষের অবস্থান। মানুষ আসলে সত্তার দুটো চক্রাবর্তের মধ্যে অবস্থান করে, যেটির সঙ্গে মানুষ অংশগ্রহণ করে বা সংবেদনশীল হয়।[৬]

সমালোচকের মতে, ফারুকী পাঠকদের প্রভাবিত করতে চান। যা শুধু অধিধর্ম সংক্রান্ত খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার ভূমিকামূলক ভূমিকাই নয়; বরং তাঁর খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার সামগ্রিক প্রস্তাবনার ক্ষেত্রেও সত্যতাবাহী। ১৯৬১ সালের ৯ ডিসেম্বর ফারুকী স্ট্যানলি ফস্টারকে লিখেন:

> আমার খ্রিষ্টীয় নৈতিকতার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আপনারা দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আমার বক্তব্য খ্রিষ্টতত্ত্বের নিকটবর্তী হলে; তা খ্রিষ্টীয় মতাদর্শের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হতো। এটি যদি খ্রিষ্টধর্ম থেকে দূরবর্তী হয়, তাহলে তা খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে মতামত প্রদানকারী মধ্যযুগের মুসলিম চিন্তাবিদ যথা ইবনে হাজম অথবা কার্ল মার্কস বা অন্যান্য পাশ্চাত্য নাস্তিকদের চিন্তাধারার নিকটস্থ অনুরূপ ভাষ্য হতে পারে। আমার দর্শন হলো এমন অবলম্বন নির্ধারণ করা যেটি প্রত্যয়ী খ্রিষ্টবাদের দূরবর্তী হলেও খ্রিষ্টবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আরব্য জাতিতত্ত্ব থেকে মুসলিম জাতিসত্তাসংক্রান্ত ধারায় ফারুকীর যাত্রা যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম ছাত্র সংস্থায় (এম.এস.এ.) সম্পৃক্ত হওয়ার পরের ঘটনা। জামাল উদ্দিন আফগানির চিন্তাদর্শনে প্রভাবিত হয়ে ফারুকী ওবওয়াহ আল-ওতুকা শীর্ষক সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংস্থার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের ঐক্যের লক্ষ্যে ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দু'ভাবে ফারুকী এ চিন্তাধারাকে প্রসারিত করেছেন। তিনি ইসলামের উত্তরাধিকারকে অমুসলিমদের মধ্যে জাগ্রতকরণে প্রণোদনা দান করেন; যা প্রকৃত মুসলমানদের কল্যাণকর্ম ও জীবনচর্যায় প্রতিফলিত হয়। অন্যটি হচ্ছে, আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতাবাদের কারণে ইসলামি চিন্তাদর্শনে সৃষ্ট দোদুল্যমানতাকে প্রতিহত করা।

আল-ফারুকী ইসলামের প্রাজ্ঞ-প্রচারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন: সকল মুসলমানের ওপর ইসলামের দাওয়াতি কাজের গুরুদায়িত্ব রয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যের কাছে ইসলামি তত্ত্বকে পৌঁছানো। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন সেমিনারে তিনি এ বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত নিম্নোক্ত দু'টি প্রবন্ধ এ গ্রন্থে সংযুক্ত হলো: ইসলামি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং পাশ্চাত্যে ইসলামি দাওয়াত: প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা। তিনি দাওয়াতকে ইসলাম প্রচারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, যে ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ড আছে; সেখানে ধর্মপ্রচার থাকতেই হবে। ধর্মের প্রচারকে বাদ দেওয়ার অর্থ প্রকৃত সত্য প্রচার হতে বিরত থাকা।[৭] দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে কেউ অন্য একজনকে তার ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে। দাওয়াতকারী ও দাওয়াত গ্রহণকারীকে পরস্পরের মধ্যে ধর্মের মর্ম সম্পর্কে উদ্যমী থাকতে হবে।

আল-ফারুকীর মতে ইসলামকে সবচেয়ে বেশি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কারণ উল্লেখ করেন:

ইসলাম বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং চিন্তাদর্শনের ইতিহাসেও এর

স্বতন্ত্রতা সুস্পষ্ট। পূর্ণভাবে বিকাশের পূর্ব থেকেই ইসলাম তার বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। এখনো ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে যৌক্তিক বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা ইহুদি, খ্রিষ্ট, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আন্তঃধর্মীয় এবং আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য অর্জন করেছে। পাশ্চাত্য-নেতৃবৃন্দ আরব বিশ্বের প্রায় ২২টি দেশ ভেঙে আরব জগতকে দুর্বল করেছে। সৌদি ভূখণ্ডকে বিপর্যস্ত করেছে। ইসলাম ধর্ম পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদকে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়েছে। বর্তমানকালে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অধিক হারে এর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ইসলাম ধর্মের শত্রু-পক্ষ অধিক বলে তারা এ ধর্মকে ভুলভাবে বিশ্বে উপস্থাপন করে থাকে।[৮]

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও দাওয়াতি কাজের মূল বৈশিষ্ট্য এর স্বরূপের মধ্যে নিহিত। ফারুকী দাওয়াতের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন: স্বাধীনতা, যৌক্তিকতা ও বিশ্বজনীনতা।

স্বাধীনতা ব্যতীত দাওয়াতের সাফল্য সম্ভব নয়। দাওয়াতদাতা ও গ্রহীতা–উভয়েরই স্বাধীনতা প্রয়োজন। দাওয়াতগ্রহীতার স্বাধীন মতামতের ওপর এর পূর্ণাঙ্গতা নির্ভর করে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ব্যাপারে অপব্যাখ্যা করা একটি গুরুতর অপরাধ। দাওয়াত হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষকে আহ্বান করা। এক্ষেত্রে এদের কাছে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, প্রভু ও বিচারক হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করানো জরুরি। দাওয়াতের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করা দাওয়াতি ধারণার পরিপন্থী। মানুষকে ইসলামমুখী করার অর্থ আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা। স্রষ্টাতে বিশ্বাস স্থাপনই মূলকথা নয়; বরং ইসলামি বিধান অনুযায়ী এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তুলনা, প্রতিতুলনা ও প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসারীদের ধর্মের বাস্তবতার দিকে আনয়ন করা প্রয়োজন। ফারুকী দাওয়াতের মতো সংবেদনশীল কর্মে যুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেন; কোনো অপযুক্তি বা গোপন কারসাজি বা নিকৃষ্টতা এতে থাকবে না। এটিকে তিনি 'মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি হিব্রু মতবাদের 'নির্বাচন' ও 'স্বজনপ্রীতি'র বিরুদ্ধে এটিকে স্থাপনে প্রয়াসী। দাওয়াতের সার্বজনীনতাকে ফারুকী অন্যান্য ধর্মমতের সাথে সম্পর্কিত করেন। যারা মুসলমান নয় তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষ্য–সামষ্টিকভাবে অন্যান্য ধর্ম-ঐতিহ্যের মধ্যেও সত্যের একরকম বিস্তার আছে। এটিকে ফারুকী ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকতা বলেছেন। কারণ সত্যের উৎস আল্লাহ। কেউ এ মতকে গ্রহণ করলে দাওয়াতের উদ্দেশ্যটিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ড. ফারুকী অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ধর্মী সমালোচনা পূর্বক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপাদনের পক্ষপাতী।

'ফারুকীর জীবনের অন্তিম পর্বে তাঁর চিন্তাদর্শন মুসলিম চিন্তার পুনর্গঠন ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম সামাজিক বিজ্ঞানীদের সংস্থা (এএমএসএস) যা ১৯৭১ সালে সৃষ্ট: এ সংস্থার মাধ্যমে 'জ্ঞানের ইসলামিকরণ' ধারণাসূচিত হয়।

প্রাথমিকপর্বে এএমএসএস. কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর মিলনক্ষেত্র হলেও ড. ফারুকী এ সংস্থার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সংস্থাটির বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ক্রমশ এ সংস্থার এই সমাজবিজ্ঞানীরা 'জ্ঞানের ইসলামিকরণ' তত্ত্বকে বিশ্বব্যাপী একটি কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্থাটি নতুনতর বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামি দৃষ্টি লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এর বিস্তৃতি ঘটে। তিনি জ্ঞানের ইসলামিকরণকে শুধু বহিরাবয়বে নয়; বরং কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। ফারুকী বিদ্যমান জ্ঞানকে ইসলামি জ্ঞানে রূপান্তরের মাধ্যমে সব জ্ঞান আল্লাহপ্রদত্ত–এ বিশ্বাসটি কার্যকর করার প্রয়াস পান। মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জনগণের চেয়ে পাশ্চাত্যের মুসলমান এ বিষয়ে অগ্রসর–ফারুকী এটি সহজেই উপলব্ধি করেন। মুসলমানপ্রধান দেশের অধিবাসীদের মধ্যে তিনি চিন্তার স্বাধীনতা ও মতাদর্শের বিনিময় অনুপস্থিত পান। যারা এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; তারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানধারা ও তাদের চাহিদার ক্ষেত্রে অসতর্ক। ড. ফারুকী জ্ঞানের ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ চিন্তক যিনি এ তত্ত্বকে একটি আন্দোলনে রূপান্তরের মাধ্যমে সামষ্টিক পর্যায়ে একে বিকশিত করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন:

> আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। পাশ্চাত্যের আমদানিকৃত বস্তু বা জিনিস কি আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবো? এক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সচেতন হতে হবে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতো আমাদের শিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে জ্ঞানকে বিশোধিত করতে হবে। এভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা ইতিহাস, আইন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইসলামি উত্তরাধিকারমূলক জ্ঞানকে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ ধরনে সজ্জিত করেছে। আমরা জ্ঞানকে ধারণ করছি এবং এর ইসলামিকরণ করছি–এ কথা বলাই কি যথেষ্ট হবে?[৯]

আল-ফারুকীর পাঠকবৃন্দ ছিল তাঁর ছাত্র; সহকর্মী এবং বিভিন্ন মুসলিম সংস্থার সদস্যগণ। তিনি প্রচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঔৎসুক্য সহকারে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় বরং বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে ধর্ম প্রচার করেছেন। তাঁর দৃষ্টি মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রে স্থিত ছিল। পাশ্চাত্যে মুসলিম বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও; সেখানে তিনি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি মুসলিম বিশ্বে ইসলামি চিন্তার স্থবিরতা লক্ষ্য

করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষার মধ্যেও উৎকর্ষের অভাব লক্ষ করেন। মুসলিম-বিশ্বে অনুপ্রবেশকৃত আধুনিক শিক্ষা ক্রমশ নিষ্ফলা ও আচারিক হয়ে পড়েছে। তন্মধ্যে প্রগতির ভ্রান্ত স্নিগ্ধতা আছে। এভাবে তিনি শুধু মুসলিম রাষ্ট্রকে ঔপনিবেশিকতার সাথেই সম্পৃক্ত করেননি; বরং মুসলিম মননেও তা ঔপনিবেশিক মানসিকতা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতরা স্বদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার অতিথিজ্ঞানকে 'পাশ্চাত্য জ্ঞান' নামে অভিহিত করেছে। সৈয়দ আহমদ খান ও মোহাম্মদ আবদুহু-র মতো ফারুকীও মনে করতেন: পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ এবং ইসলামি মূল্যবোধের ক্ষতি সাধনে অক্ষম–পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এ মতবাদকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সত্য ও জ্ঞানের লক্ষণ অপরিচিত বিশ্বের মূল্যবোধের সমান। ফারুকীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল: বিচার বিবেচনা ব্যতীত জ্ঞানের মূল্যবোধ আমদানি মুসলিম বিশ্বের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। শেষ অবধি জ্ঞানের ইসলামিকরণের পরিণতিকে প্রাজ্ঞভাবে পরিচালিত করা যায়নি। সাধারণ মুসলমানসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দও, বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলিম অভিজাতগণ পাশ্চাত্য উৎপাদনশীলতা, ক্ষমতা, স্রষ্টা ও মানুষ, জীবন, প্রকৃতি, বিশ্ব, সময় ও ইতিহাস সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকধাঁধায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[১০] এভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও জীবনচর্চাকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ইসলামি উত্তরাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষ তৈরি করে চলেছে।

ফারুকী দার্শনিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে প্রশিক্ষিত হলেও তাঁর রচনাকর্ম প্রথাগত শিক্ষাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়নি। ফলে তাঁর দর্শন ধর্মের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করেনি। তিনি বিশ্বের ধর্মসমূহ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তাঁর বিশ্লেষণ পদ্ধতি সত্যনির্ভর ও ইসলামিভাবনাপ্রসূত।

ইসলাম ধর্মের ঐক্য ও উৎসের দিকে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক দৃষ্টি রেখে ফারুকী ধর্মকে বিবেচনা করেছেন। তাঁর চিন্তার অন্যতম বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্য হলো: সর্বত্র ইসলামিকরণ। বিভিন্নমুখী ঐতিহ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির দোলাচল তাঁর অনুসন্ধানী মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো; তাই তিনি মুসলিম মননে জীবনদৃষ্টির স্বচ্ছতা ও প্রাজ্ঞতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি জোরপূর্বক আমাদের পরিচালিত করেন না। পাঠক অনায়াসে তাঁর মতামত গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা অস্বীকার বা অবজ্ঞা করতে পারে না।

এ গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ ড. ইসমাইল রাজি আল-ফারুকী বিশ বছরব্যাপী রচনা

করেছেন। যেসব রচনা অন্য ধর্মবিশ্বাসকেন্দ্রিক; বিশেষ করে খ্রিষ্টবাদ ও ইহুদিধর্ম সম্পৃক্ত–সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলো ফারুকীর আন্তঃধর্মীয় সংলাপসংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। এখানে সংগৃহীত এগারটি রচনা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের নির্দেশক। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিষয়ক তাঁর প্রধান লেখাসমূহ এখানে সংকলিত হয়েছে। নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ড. ফারুকীর প্রবল প্রজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ। গ্রন্থসমূহ হচ্ছে: ঞযব এৎবধঃ অংরধহ জবষরমরড়হং (New York: Macmillan, 1969); The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan, 1986)। স্ত্রী লুইস লামিয়া সহযোগে আল-ফারুকী সম্পাদিত গ্রন্থ শিকাগোতে তাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের পর একই বছরে প্রকাশিত হয়েছিল।

অংশ - ১ এ নিকটপ্রাচ্যের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান প্রাপ্তব্য। ইবরাহিম আ. এবং তাঁর পূর্বের ধর্মসমূহ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন: কীভাবে ধর্ম সম্পর্কে ইসলামি বিশ্বদৃষ্টি বিষয়টিকে সংযুক্ত করে। ইহুদি খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থের সাথে ইসলাম কীভাবে সম্পর্কিত তা এ অংশে নির্দেশিত হয়েছে।

অংশ - ২ তে ইসলাম, খ্রিষ্ট ও ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে এখানে আলোচনা আছে।

অংশ - ৩ এ আন্তর্জাতিক সেমিনারে পঠিত ইসলামি দাওয়াত বা প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাজ্ঞ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপিত। পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতে দাওয়াতকে উপস্থাপনের দূরদৃষ্টি এখানে আলোচ্য।

আমাদের সংকলনে কিছু বক্তব্য ও মতামতের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও ড. ফারুকীর ধর্মসংক্রান্ত জীবনদৃষ্টির সারাৎসার এতে আমরা উপস্থাপন করতে পেরেছি।

লেস্টার
২০ জানুয়ারি, ১৯৯৮

আতাউল্লাহ সিদ্দিকী

তথ্যনির্দেশ

1. Al-Faruqi's letter dated 14 November 1963.
2. I.R. Al Faruqi and L.L. Al Faruqi, The Cultural Atlas of Islam (New York: Macmillan, 1986), p. 50.
3. I.R. Al Faruqi, 'Divine Transcendence and Its Expression', in Henry O. Thompson (ed.), TheGlobal Congress of the World's Religions, Proceedings of 1980-1982 Conference (Washington, DC: The Global Congress of the World's Relogions, Inc. 1982), pp. 267-316.
4. I.R. Al Faruqi, Urubah and Religion (Amsterdam: Djambatan, 1962), pp. 2-3.
5. Letter dated 9.12.1961 to Stanley Frost, Dean of the Faculty of Divinity Mcgill University.
6. Ataullah Siddiqui, Christian-Muslim Dialogue in the Twentieth Century (Basingstoke, UK: Macmillan, 1997), pp. 88-9.
7. I.R. Al Faruqi and L.L. Al Faruqi, The Cultural Atlas of Islam, op. cit., p. 187.
8. I.R. Al Faruqi, 'Islam', in wing-tsit Chan et al. (eds.), The Great Asian Religions (London: Macmillan, 1969), p. 307.
9. The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 5, No. 1 (1988), p 16.
10. International Institute of Islamic Thought, Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, Second Revised Eduition, 1989), p. 4.